গান্ধীবাদ
তফসিলীদের মৃত্যুদণ্ড

ডঃ বি. আর. আম্বেদকারের

WHAT CONGRESS AND GANDHI HAVE DONE TO THE UNTOUCHABLES ?

গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী

গান্ধীবাদ : তফসিলীদের মৃত্যুদণ্ড

ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের

What Congress And Gandhi Have
Done To The Untouchables ?

গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ করেছেন :

রণজিত কুমার সিকদার

"ভারতের তফসিলী সমাজের যদি কোন চরম শত্রু থেকে থাকে, তিনি হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।"

—ডঃ আম্বেদকর

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী

GANDHIBAD : TAPSILIDER MRITYUDANDA Rs. 8·00

Published by Dr. Ambedkar Prakashani
Publisher : Sm. Renu Sikdar
Po + Vill—Dhalua, Dist.—S-24 Parganas, W. B.
Pin-743516 Phone No : 462-0440

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনীর পক্ষে
প্রকাশিকা ঃ শ্রীমতী রেণু সিকদার
গ্রাম ও পোঃ—ঢালুয়া, জিলা—দঃ ২৪ পরগণা
পিন—৭৪৩৫১৬

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৯৬

মুদ্রাকর ঃ শ্রীমুক্তিমোহন ঘোষ
ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ (১) রণজিত কুমার সিকদার
গ্রাম ও পোস্ট—ঢালুয়া, জিলা—দঃ ২৪ পরগণা
পিন—৭৪৩৫১৬
(গড়িয়া রেল স্টেশনের পূর্বদিকে ৫ মিনিটের পথ)

(২) আম্বেদকর ভবন
৩৮ বি, স্কট লেন, শিয়ালদহ, কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য ঃ আট টাকা মাত্র

(লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

ভূমিকা

'গান্ধীবাদ ঃ তফসিলীদের মৃত্যুদণ্ড' পুস্তিকাটি ডঃ আম্বেদকরের সুপরিচিত গ্রন্থ 'What Congress And Gandhi Have Done To The Untouchables ?' এর একাদশ অধ্যায় থেকে অনূদিত।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে গান্ধিজীর ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ। প্রবেশ না বলে আবির্ভাব বলাই ভাল। কংগ্রেসে ঢুকেই তিন বছরের মধ্যেই তিনি কংগ্রেসের সর্বেসর্বা হয়ে গেলেন। রাজনৈতিক পার্টি চালাতে হলে চাই প্রচুর অর্থ। বেনিয়া-নন্দন গান্ধিজী তার গুজরাটের বেনিয়া শ্রেণীকে বোঝালেন যে, অর্থ বিনিয়োগের সবচেয়ে লাভজনক ক্ষেত্র হল রাজনীতি। ফলে অর্থের অভাব হল না গান্ধিজীর। বর্ণাশ্রমের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে তিনি ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দুদের বিশ্বাস অর্জন করলেন। ধর্মীয় প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে নিরক্ষর শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের মোহমুগ্ধ করতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে পারঙ্গম ব্যক্তি। এব্যাপারে চরকা ও রামধুন তার অভিনব আবিষ্কার বলতে হবে। 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' গান ও খিলাফত আন্দোলন করে তিনি মুসলমানদের জুড়ে দিতে চাইলেন কংগ্রেসে। রাজনীতিতে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন আমদানি করে বৃটিশকে হুমকী দিতে সুরু করেন। ফলে চারদিকে গান্ধিজীর জয় জয়কার ধ্বনিত হতে থাকে। 'বুনিয়াদী শিক্ষা প্রকল্প' ও 'হরিজন সেবক সংঘ' সৃষ্টিকরে তিনি দরিদ্র গ্রামবাসী ও তফসিলী সমাজকে রাজনীতির গোলক ধাঁধায় টেনে আনেন। বিজ্ঞান, যন্ত্র ও কলকারখানাকে মানব সভ্যতার অভিশাপ বলে বর্ণনা করে তিনি গোঁড়া বর্ণহিন্দুদের দারুণ প্রিয়পাত্র হন। তার সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘোষণা হল ইংরেজদের তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন করার একমাত্র 'ধন্বন্তরী দাওয়াই' হল তার 'জাতীয় কংগ্রেস' নামক প্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত হল তার অভিনব রাজনৈতিক দর্শন অর্থাৎ 'গান্ধীবাদ'।

মুসলিম, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গান্ধীবাদের গোলক-ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও অস্পৃশ্য তফসিলীরা গান্ধীবাদের মনোমুগ্ধকর পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে গেল। তাই নিপীড়িত-মুক্তিযোদ্ধা বাবাসাহেব আম্বেদকর চাইলেন গান্ধীবাদের গোলক-ধাঁধা থেকে অস্পৃশ্য ও তফসিলীদের মুক্ত করতে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজনৈতিক দলিল সহ লিখলেন 'What Congses And Gandhi Have Done To The Untouchables ?' গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থের উপসংহার হিসাবে লেখা হয়েছে একাদশ অধ্যায়—'Gandism ঃ The Doom of The Untouchables'।

'গান্ধীবাদ ঃ তফসিলীদের মৃত্যুদণ্ড' পুস্তিকাটি তারই বঙ্গানুবাদ। মূলগ্রন্থে 'অস্পৃশ্য' নামটি থাকলেও ১৯৩৫ সালের 'ভারতশাসন আইনে' অস্পৃশ্যদের 'তফসিলী' নামে অভিহিত করা হয়। তাই এই বইটিতে 'অস্পৃশ্যদের' পরিবর্তে 'তফসিলীদের' নামটি গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ-মুক্তিকামী প্রতিটি তফসিলী ও শূদ্র সমাজের মানুষকে গান্ধীবাদের আসল রহস্যটি অনুধাবন করতে হলে বইটি অবশ্যই পাঠ করা প্রয়োজন। তাই আমরা পুস্তিকাটি সুলভে পাঠকদের সংগ্রহ করার জন্য আলাদা করে প্রকাশ করলাম। মূল অনুবাদটি 'কংগ্রেস ও গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের জন্য কি করেছেন?' গ্রন্থে অনেক আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। যাহোক পুস্তিকাটি গান্ধী চরিত্র উদ্ঘাটনে সহায়ক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। জয় ভীম! জয় ভারত!!

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৯৬
চালুয়া, দঃ ২৪ পরগণা

বিনীত,
রণজিত কুমার সিকদার

গান্ধীবাদ : তফসিলীদের মৃত্যুদণ্ড

১

ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। যেমন—ব্যক্তিবাদ বনাম সমষ্টিবাদ, পুঁজিবাদ বনাম সমাজবাদ, সংকীর্ণতাবাদ বনাম প্রগতিবাদ প্রভৃতি। কিন্তু সম্প্রতি আরো একটি নূতন মতবাদের আলোচনা ভারতের সর্বত্র ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে—সেটি হল গান্ধীবাদ। গান্ধিজী অবশ্য নিজে গান্ধীবাদের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করতে চাচ্ছেন না। গান্ধিজীর প্রতিবাদের সুর শুনে মনে হচ্ছে এটা তাঁর বৈষ্ণবীয় বিনয় ছাড়া কিছু নয়। তার দ্বারা গান্ধীবাদের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না। 'গান্ধীবাদ' নাম দিয়ে বেশ কয়েকখানি পুস্তকও বাজারে প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধিজী সেগুলি সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ জানান নি। এ বিষয়ে ভারতের ভিতরের এবং বাইরের অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কিছু কিছু ব্যক্তি গান্ধীবাদের এত ভক্ত হয়ে উঠেছেন যে, একে তারা মার্কসবাদের বিকল্প বলে মনে করছেন।

যে সব গান্ধীবাদীরা আমার পূর্ববর্তী বক্তব্যগুলি পাঠ করেছেন তারা হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন—অস্পৃশ্যরা গান্ধিজীর কাছে যা আশা করেছিলেন তা হয়ত তিনি পূরণ করতে পারেন নি ; তাই বলে কি গান্ধীবাদের মধ্যে অস্পৃশ্যদের আশা করার মত কিছু নেই ? গান্ধিজীর ভক্তজনেরা হয়ত আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন যে, আমি কেবল তাঁর দোষ-ত্রুটি এবং অস্পৃশ্যদের জন্য সাময়িকভাবে গৃহীত কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনা করছি ; কিন্তু অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য তিনি যে সব দীর্ঘ মেয়াদী নীতির কথা ব্যক্ত করেছেন সে সবের কথা আমি ভুলে গিয়েছি। আমি একথা স্বীকার করি যে, অনেক সময় এমন কিছু কিছু সাময়িক পদক্ষেপ নেওয়া হয় যা তার নিজস্ব গতিশক্তির মাধ্যমে পরবর্তীকালে দীর্ঘমেয়াদী

পদক্ষেপে পরিণত হতে পারে এবং যে সব প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ পড়েছিল তাও পরে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

পাঠ করার পক্ষে গান্ধীবাদ একটা খুব মনোমুগ্ধকর মতবাদ। কিন্তু গান্ধিজীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর অস্পৃশ্যরা গান্ধীবাদ সম্পর্কে পড়াশুনা করতে গেলে তা তাদের কাছে খুবই বিরক্তিকর বলে মনে হবে বলে আমার ধারণা। বিশেষ করে গান্ধীবাদ সম্পর্কে আমি যদি কিছু না বলে চুপ করে যাই তা হবে আরো দুর্ভাগ্যজনক। গান্ধিজীর চরিত্র সম্পর্কে আমি মুখোস খুলে দেওয়া সত্ত্বেও অনেকে হয়ত একথা প্রচার করতে থাকবে যে, গান্ধিজী ব্যক্তিগতভাবে অস্পৃশ্যদের সমস্যা সমাধান করতে না পারলেও গান্ধীবাদের মধ্যে অস্পৃশ্যরা তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে। এই কারণেই আমি গান্ধীবাদ সম্পর্কে পুঙখানুপুঙখ পর্যালোচনা করতে চাই, যাতে গান্ধীবাদ সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তিমূলক প্রচার অভিযান কেউ চালাতে না পারে।

২

এবার দেখা যাক গান্ধীবাদ কি? এর মূল নীতিগুলি কি? এতে কিভাবে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়েছে? সমাজ-ব্যবস্থার সমাধান সম্পর্কে সেখানে কি বক্তব্য রাখা হয়েছে?

প্রথমে একথা বলা প্রয়োজন যে, গান্ধীবাদ সম্পর্কে কিছু কিছু গান্ধীবাদী এরূপ কিছু ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন যা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। তারা এরূপ একটি ধারণার সৃষ্টি করেছেন যে, গান্ধীবাদ হল গ্রামে ফিরে যাওয়ার মতবাদ এবং গ্রামকে স্বনির্ভর করে তোলার মতবাদ। এর দ্বারা গান্ধীবাদকে একটা আঞ্চলিকতার মতবাদে পরিণত করা হয়েছে। আমার মনে হয় গান্ধীবাদ এত সহজ ও সরল প্রকৃতির মতবাদ নয়। গান্ধীবাদের পরিসর আঞ্চলিকতাবাদের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক। আঞ্চলিকতাবাদ তার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এর মধ্যে একটা সামাজিক দর্শন এবং একটা অর্থনৈতিক দর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শনকে বাদ দিয়ে গান্ধীবাদ সম্পর্কে

আলোচনা করলে তা গান্ধীবাদ সম্পর্কে একটা অসত্য চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলে ধরবে। তাই আমার অন্যতম কর্তব্য গান্ধীবাদ সম্পর্কে একটা যথার্থ চিত্র দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরা।

প্রথমেই সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে গান্ধিজীর বক্তব্য কি তার আলোচনা করা যাক। ভারতের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মূল বিষয় যে জাতব্যবস্থা, সে সম্পর্কে গান্ধিজীর চিন্তাধারা কি, তা তিনি সুন্দরভাবে ও বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করেছেন ১৯২১-২২ সালে 'নবজীবন' নামক একটি গুজরাটী পত্রিকায়। উক্ত লেখাটি গান্ধিজীর 'শিক্ষক' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনমুর্দ্রিত হয়েছে। মূল রচনাটি গুজরাটী ভাষায় লেখা হয়েছিল। আমি এখানে তার ইংরেজী অনুবাদ করে দিচ্ছি। গান্ধিজী সেখানে বলেছেন ঃ—

"১। আমি বিশ্বাস করি হিন্দুসমাজ যে আজও টিকে আছে তার কারণ হল, তা জাতব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

"২। ভারতের স্বরাজের বীজ নিহিত রয়েছে জাতব্যবস্থার মধ্যে। বিভিন্ন জাতি হল একটি সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের মত। প্রতিটি বিভাগই সামগ্রিক কল্যাণের নিমিত্ত কাজ করে চলেছে।

"৩। যে সম্প্রদায় এই জাতব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে, বলতে হবে তারা একটা অনন্যসাধারণ সংগঠন শক্তির ধারকবাহক।

"৪। জাতব্যবস্হা প্রাথমিক শিক্ষার স্বাভাবিক বাহন। প্রত্যেক জাতি তার শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি রয়েছে। প্রত্যেকটি জাতি সমাজের এক একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হতে পারে। জাতিগুলি তাদের মধ্য থেকে স্ব স্ব জাতির বিচারক নির্বাচিত করে সুষ্ঠু বিচারব্যবস্হা পরিচালনা করতে পারে। প্রত্যেকটি জাতি তাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজস্ব রক্ষী-বাহিনীও গঠন করতে পারে।

"৫। আমি বিশ্বাস করি জাতীয় ঐক্যের জন্য অসবর্ণ বিবাহ বা বিভিন্ন জাতির একত্রে খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন নেই। অভিজ্ঞতা

এই কথাই বলে যে, একত্রে ভোজ বন্ধুত্ব সৃষ্টির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা করে থাকে। যদি তাই না হত তবে ইউরোপে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হোত না। একত্রে খাওয়া-দাওয়া পায়খানা-প্রস্রাব করার মত নোংরা কাজ। তবে পার্থক্যটা হল পায়খানা করে আমরা একটা মানসিক স্বস্তি পাই; কিন্তু একত্রে খাওয়া দাওয়া করে আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হই। আমরা যেমন লোক চক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেই, তেমনি খাওয়া-দাওয়া লোকচক্ষুর অন্তরালেই হওয়া উচিত।

"৬। ভারতে ভাই-ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহ হয় না। তাদের মধ্যে বিয়ে হয় না বলে কি তাদের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসার অভাব থাকে? বৈষ্ণব সমাজে এখনও দেখা যায় যে অনেক মেয়েরা তাদের পরিবারের অন্যদের সাথে একত্রে আহার করে না, বা একই জলপাত্র থেকে জলপান করে না। তাই বলে কি তাদের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার অভাব থাকে? বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ বা একত্রে খাওয়া-দাওয়া নেই বলে জাতব্যবস্থাকে খারাপ বলা যাবে না।

"৭। জাতির আর এক নাম নিয়ন্ত্রণ। জাতব্যবস্থা আমাদের ভোগবিলাসকে নিয়ন্ত্রিত করে। জাতব্যবস্থা আমাদের ভোগ-বিলাসকে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেয় না। এই ভোগবিলাসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই অসবর্ণ বিবাহ এবং অসবর্ণ ভোজ ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

"৮। জাতব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে আহ্বান করার অর্থ হল, জন্মগত পেশা যা জাতব্যবস্থার প্রাণ-স্বরূপ তাকে ত্যাগ করা। জন্মগত পেশা একটা চিরন্তন কল্যাণের নীতি। একে পরিবর্তন করার অর্থই হল সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। আমি মনে করি একজন ব্রাহ্মণ চিরকালই ব্রাহ্মণ থাকবে। ব্রাহ্মণকে যদি শূদ্র হতে হয় এবং শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ হতে পারে তাহলে তো সমাজে শৃংখলা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

"৯। জাতব্যবস্থা হল সমাজের স্বাভাবিক বিধি। ভারতে তাকে একটা ধর্মীয় আবরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র। পৃথিবীর

অন্যান্য দেশের মানুষেরা জাতব্যবস্থার গুরুত্বটা বুঝে উঠতে পারে নি। তাই ভারতে জাতব্যবস্থা যেমন সুফল লাভ করেছে অন্য কোন দেশে তা পারে নি।

"জাতব্যবস্থা ভাঙ্গার জন্য যেসব ব্যক্তি আন্দোলন করছেন তাদের বিরুদ্ধে এই হল আমার বক্তব্য।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে গান্ধিজী ছিলেন জাতব্যবস্থার একজন উগ্র সমর্থক। ১৯২৫ সালে দেখা গেল তিনি জাতব্যবস্থাকে কিছুটা সমালোচনা করেছেন। ১৯২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী গান্ধিজী বললেন :—

"আমি জাত-ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলাম, কারণ তা নিয়ন্ত্রকে সমর্থন করে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে জাতব্যবস্থা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে না ; তা মানুষের কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ করছে। নিয়ন্ত্রণ ভাল ; কারণ তা স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করে। কিন্তু সীমাবদ্ধতা শৃঙ্খলতুল্য ; তা মানুষকে বেঁধে রাখে। বর্তমানে জাতব্যবস্থাকে সমর্থন করা যায় না। তা বর্তমানে শাস্ত্র বিরোধী হয়ে উঠেছে। জাতির সংখ্যা অসংখ্য। তা অসবর্ণ বিবাহে বাধা সৃষ্টি করছে। এটা উন্নতির সহায়ক হতে পারে না। এটা এক ধরণের জাতীয় স্খলন।"

এর সমাধান কি ? এই প্রশ্নের জবাবে গান্ধিজী বলেন :—

"এই সমস্যার সমাধান হল, ছোট ছোট জাতিগুলিকে এক করে একটা বড় বড় জাতিতে পরিণত করা। প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মত সমস্ত জাতিগুলিকে মাত্র ৪টি জাতিতে পরিণত করা।"

এইভাবে গান্ধিজী শেষ পর্যন্ত বর্ণব্যবস্থার সমর্থকে পরিণত হলেন। প্রাচীনকালে ভারতের বর্ণব্যবস্থার ৪টি বিভাগ ছিল। যথা (১) ব্রাহ্মণ—যাদের কাজ ছিল শিক্ষাদীক্ষা ; (২) ক্ষত্রিয়—যাদের কাজ ছিল যুদ্ধবিদ্যা ; (৩) বৈশ্য—যাদের কাজ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, এবং (৪) শূদ্র—যাদের কাজ অন্য তিন বর্ণের সেবা। গান্ধিজীর জাতব্যবস্থা কি প্রাচীনকালের বর্ণব্যবস্থার অনুরূপ ছিল না ? এ সম্পর্কে গান্ধিজীর নিজের বক্তব্য শোনা যাক। গুজরাটী ভাষায় গান্ধিজীর নিজের লেখা 'বর্ণব্যবস্থা'

নামক গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে কিছুটা অংশ এখানে সন্নিবেশিত করা হল ঃ—

"১। জন্মগতভাবে বর্ণবিভাগে আমি বিশ্বাসী।

"২। বর্ণব্যবস্থার মধ্যে এমন কোন বিধিনিষেধ নাই যাতে শূদ্রের পক্ষে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি হতে পারে। বর্ণব্যবস্থায় যে নির্দেশ রয়েছে তা হল, কোন শূদ্র শিক্ষাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। এ নিষেধ ক্ষাত্রিয়দের উপরও রয়েছে। এমন কি ব্রাহ্মণও অস্ত্রবিদ্যা শিখতে পারে; কিন্তু সে তাকে জীবিকা হিসাবে নিতে পারবে না।

"৩। বর্ণব্যবস্থার যা বিধিনিষেধ তা জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে কোন বর্ণের লোক অন্যবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যা শিখতে পারবে, তবে সে কখনো তার নিজ বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট পেশা ব্যতীত অন্য বর্ণের পোশাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। জীবিকা হিসাবে প্রত্যেক বর্ণের মানুষকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট পিতৃপুরুষের পেশাকে অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন করতে হবে।

"৪। বর্ণব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল, যাতে পেশা নিয়ে একবর্ণের সঙ্গে অন্যবর্ণের শ্রেণী সংগ্রাম না বাধে। আমি বর্ণব্যবস্থাতে বিশ্বাস করি এই জন্য যে, তা এক এক বর্ণের জন্য পৃথক পৃথক পেশা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

"৫। বর্ণব্যবস্থার অর্থ হল কোন মানুষের জন্মের পূর্ব থেকেই তার পেশাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

"৬। বর্ণব্যবস্থায় কোন ব্যক্তিরই মন পছন্দ পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা নেই। তার পেশা নির্বাচন হবে তার উত্তরাধিকার সূত্রে।"

জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে গান্ধিজী দুটি আদর্শকে অনুসরণ করেছে। তার একটি হল যান্ত্রিক উৎপাদনের বিরোধিতা। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার ১৯২১ সালের ১৯ জানুয়ারী সংখ্যায় তিনি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন ঃ—

"আমি কি প্রগতির গতিপথ রুদ্ধ করতে চাই? আমি কি

রেলগাড়ীর পরিবর্তে গরুর ও ঘোড়ার গাড়ীর সমর্থক ? আমি কি যন্ত্রব্যবস্থার বিরোধী ? প্রায়ই এই সব প্রশ্ন আমাকে সাংবাদিক ও জননেতারা করে থাকেন।

"এই সব প্রশ্নে আমার উত্তর হল ঃ যান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না ; কারণ যন্ত্রব্যবস্থা ও যান্ত্রিক উৎপাদনকে আমি বিপত্তিকর বলে মনে করি।"

তিনি যে যন্ত্রব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন তার অন্যতম কারণ হল তাঁর চরকা-প্রীতি। তিনি ছিলেন হস্তচালিত তাঁতের পক্ষপাতী। তাঁর যন্ত্রবিতৃষ্ণা এবং চরকা-প্রীতি কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। এটা ছিল তাঁর একটা জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শন তিনি ১৯২৫ সালের ৮ জানুয়ারীতে কাঁথিওয়ারের রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ—

"জাতি এখন উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাণহীন যন্ত্রের ব্যবহারে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রাচীন উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ আমরা এখন প্রাণহীন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছি এবং পুরাতন সজীব ব্যবস্থাকে ত্যাগ করতে চলেছি। এটা ঈশ্বরের বিধান যে, আমরা আমাদের দেহকে যথাযথভাবে কাজে লাগাব। হস্তচালিত তাঁতের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেহকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারি, যাকে বলা যায় 'শারীর-যজ্ঞ'। এই শারীর-যজ্ঞকে অস্বীকার করে আমরা শ্রমকে ফাঁকি দিচ্ছি। শ্রমকে ফাঁকি দেওয়ার অর্থ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। এর ফলে আমরা সৌভাগ্য দেবীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।"

গান্ধিজী 'হিন্দু স্বরাজ' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই বইখানি যিনি পড়েছেন তিনি বুঝতে পারবেন যে, আধুনিক সভ্যতার উপর গান্ধিজী কিরূপ চটা ছিলেন। এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৮ সালে। এত বছর পরেও গান্ধিজীর জীবনদর্শনে কোন পরিবর্তন ঘটে নি। ১৯২১ সালে ২৬ জানুয়ারীতে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখেছেন ঃ—

"১৯০৮ সালে লেখা আমার বইটিতে আধুনিক সভ্যতাকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছিল। এবিষয়ে আমার অনুভূতি আরো গাঢ় হয়েছে। ভারতকে আধুনিক সভ্যতা বর্জন করতে হবে। তবেই ভারতের উন্নতি ঘটা সম্ভব।"

তারপর তিনি 'ধর্মমন্হন' নামক গ্রন্হের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখলেন ঃ—

"পাশ্চাত্য সভ্যতা শয়তানের সৃষ্টি।"

গান্ধিজীর দ্বিতীয় আদর্শটি হল ঃ মালিক ও শ্রমিক এবং জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামকে দূরীভূত করা। এই সম্পর্কে গান্ধিজীর অভিমতটা কি তা 'নবজীবন' পত্রিকার ১৯২১ সালের ৮ জুন তারিখে প্রকাশিত তাঁর লেখা থেকে শোনা যাক ঃ—

"ভারতের সম্মুখে দুটি পথ খোলা আছে। একটি হচ্ছে পাশ্চাত্য নীতি যাতে বলা হয়েছে—'জোর যার, মুল্লুক তার'। অন্যটি হচ্ছে প্রাচ্যনীতি যাতে বলা হয়েছে—'সত্যই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে'। সত্যের কোন বিপর্যয় নেই। সবল এবং দুর্বল উভয়েরই ন্যায়বিচার লাভের সমান অধিকার বিদ্যমান। শ্রমজীবী শ্রেণীর কথাই ধরা যাক। শ্রমিকেরা কি জোর করে তাদের বেতন বৃদ্ধি ঘটাবে? তাদের দাবী যতই ন্যায়সঙ্গত হোক তারা একাজে কখনো বলপ্রয়োগ করতে পারে না। অধিকার লাভের জন্য বলপ্রয়োগ হয়ত সাফল্যলাভের পক্ষে সহজ হতে পারে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ফল বিষময় হতে বাধ্য। যারা অস্ত্রের উপর নির্ভর করে বাঁচে তাদের নিধনও অস্ত্রের দ্বারাই হয়। সাঁতারুরা প্রায়ই জলে ডুবে মরে। ইউরোপের দিকে তাকাও। কেউই সেখানে সুখী নয়, কেউই সন্তুষ্ট নয়। শ্রমিকরা মালিকদের বিশ্বাস করে না; আর মালিকদের শ্রমিকদের উপর কোন বিশ্বাস নেই। উভয়ের মধ্যেই শক্তি ও সাহস আছে—যেমন দুই বিবদমান ষাঁড়ের মধ্যে। তারা লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হয়। গতি মানেই প্রগতি নয়। একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে, ইউরোপের মানুষ উন্নতি লাভ করেছে। তারা হয়ত ধনসম্পদ লাভ করতে পারে; কিন্তু তদ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, তারা নৈতিক গুণাবলী অর্জন করেছে।…

"তাহলে আমরা কি করব? বোম্বাইর শ্রমিকেরা খুব ভাল পথ অবলম্বন করেছে। আমি অবশ্য বিস্তারিত সংবাদ অবগত নই। তবে আমি এটুকু জেনেছি যে, তারা খুব সঙ্গতভাবেই লড়াই করছে। হয়ত মালিকপক্ষ ভুল করেছে। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে সব লড়াই হয় তাতে সাধারণতঃ মালিক পক্ষ খুব একটা অন্যায় কিছু করে না। কিন্তু শ্রমিকরা যখন সংঘবদ্ধ হয় এবং তাদের শক্তি সম্পর্কে অবগত হয়, তখন তারা মালিকদের চেয়ে অধিকতর অত্যাচারী হয়ে ওঠে। শ্রমিকরা যখন মালিকদের বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে, তখন শ্রমিকরা যা বলে মালিকরা তাই শোনে; কিন্তু শ্রমিকেরা কখনো মালিকদের বুদ্ধি-সমপর্যায়ে যেতে পারে না। যদি শ্রমিকদের বুদ্ধিবৃত্তি সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারত তাহলে তারা আর শ্রমিক থাকত না, মালিক হয়ে যেতে পারত। মালিকপক্ষ কেবলমাত্র টাকার জোরে লড়ে না। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কৌশল অনেক উন্নত মানের।

"তাহলে আমাদের সম্মুখে প্রশ্নটি হল : যখন শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয় এবং সচেতন হয়ে ওঠে তখন তাদের কর্তব্য কি হবে? যদি শ্রমিকেরা তাদের সংঘবদ্ধ শক্তির উপর নির্ভর করে, তা হবে পশু-শক্তির উপর নির্ভর। তদ্দারা তারা দেশের শিল্পের উপর আঘাত হানবে এবং নিজেদের ক্ষতি করবে। কিন্তু তারা যদি বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে ব্যক্তি স্বার্থটা বড় করে না দেখে, তবে তারা যে কেবল উন্নতি করবে তাই নয়, তারা মালিকদের মনেরও পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। তাতে দেশের শিল্পের উন্নতি ঘটবে এবং মালিক ও শ্রমিক যেন একই পরিবারের সদস্য এরূপ পরিবেশ গড়ে উঠবে।"

১৯২২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাতে গান্ধিজী বলেছেন :—

"এরূপ অবস্থা পূর্বে কখনো ছিল না। ভারতের ইতিহাসে কখনো শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক এত খারাপ ছিল না।"

এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে শ্রমিকদের ধর্মঘট সম্পর্কে গান্ধিজীর কিরূপ অভিমত ছিল তা ১৯২১ সালে ১১ আগস্টের

'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার তিনি প্রকাশ করেছেন ঃ—

"বড় বড় ধর্মঘট পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রমিক নেতাদের প্রতি আমার উপদেশসমূহ নিম্নে পুনরায় ব্যক্ত করা হল।

"(১) প্রকৃত বিক্ষোভ ব্যতীত কোন ধর্মঘট করা উচিত নয়।

"(২) শ্রমিকদের যদি নিজেদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট পরিমান সঞ্চয় না থাকে অথবা ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে কোন স্বল্পকালীন কাজ করে সংসার চালানোর সুযোগ না থাকে, তাহলে তাদের কখনো ধর্মঘটে নামা উচিত হবে না। ধর্মঘটী শ্রমিকদের কখনো জনগণের চাঁদা বা দানের উপর নির্ভর করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়।

"(৩) ধর্মঘটী শ্রমিকগণ এমনভাবে তাদের সর্বনিম্ন দাবী-দাওয়া স্থির করবে, যা কোনক্রমেই পরিবর্তন করতে না হয়।

"(৪) শ্রমিকদের দাবী যতই যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, দীর্ঘ কালব্যাপী ধর্মঘট চালাবার ক্ষমতা তাদের যত বেশী থাক না কেন, যদি তাদের জায়গায় কাজ করার মত অন্য লোক পাওয়া যায় তবে তাদের ধর্মঘট ব্যর্থ হতে বাধ্য। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনো তাদের বেতন বৃদ্ধি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করবে না—যদি দেখা যায় যে তাদের পরিবর্তে কাজ করার মত আরো লোক রয়েছে। কিন্তু মানবপ্রেমিক বা দেশপ্রেমিক কোন ব্যক্তি তার দাবী পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ধর্মঘট করবেন যদি দেখা যায় যে, তাতে তার প্রতিবেশীদের দুর্দশার লাঘব হবে। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ধর্মঘটে কোনপ্রকার ভীতি প্রদর্শন, অগ্নিসংযোগ বা ঐ জাতীয় কোন প্রকার কাজের কোন অবকাশ নেই। এটা আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত যে, শ্রমিক নেতারা যেন কখনো ধর্মঘটী শ্রমিকদের কংগ্রেস বা অন্য কোন জনসাধারণের তহবিল থেকে কোনপ্রকার আর্থিক সাহায্যের পরামর্শ না দেন। শ্রমিকেরা অন্যদের নিকট থেকে যেত বেশী আর্থিক সাহায্য নেবেন তাদের প্রতি জনসমর্থন ততটা কমতে থাকবে। সহানুভূতিশীল জনগণকে যত বেশী আর্থিক সাহায্য

করতে হবে ধর্মঘটীদের প্রতি নৈতিক সমর্থন সেই পরিমাণে কমতে থাকবে।"

১৯২৯ সালের ১৮ মে তারিখে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় জমিদার ও প্রজাদের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে গান্ধিজীর নির্দেশ প্রকাশিত হয়; কারণ ঐ সময়ে উত্তর প্রদেশের প্রজারা জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেছিল। গান্ধিজী বলেন ঃ—

"যতক্ষণ না উত্তর প্রদেশের সরকার তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছে বা জনগণকে ভীতি প্রদর্শন করছে, ততক্ষণ কৃষকগণ তাদের দলবদ্ধ শক্তির বিচারসম্মত প্রয়োগ করবে এতে কোন সন্দেহ নাই। শোনা যাচ্ছে যে, কতিপয় জমিদারীতে কৃষকরা তাদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে ও আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে এবং তাদের ইচ্ছামত কাজ না হলেই তারা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছে। এমন কি তারা সামাজিক বয়কটকেও অপব্যবহার করছে এবং হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করছে। শোনা যাচ্ছে যে, তারা জমিদারদের প্রতি জল, নাপিত ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে। এমনকি তাদের প্রাপ্য খাজনা পর্যন্ত দিচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে যে, কিষানদের আন্দোলন নাকি অসহযোগ আন্দোলনকারীদের নিকট থেকে সাহায্য পাচ্ছে যদিও সে সময় এখনো আসে নি।

"আমরা কৃষকদের এই উপদেশই দেব যে, হয়ত কোন সময়ে আমরা সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে পারি; তাই বলে জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা থেকে বঞ্চিত করার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। আমাদের কৃষক আন্দোলনের লক্ষ্য হল, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটান এবং জমিদারদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কেরও উন্নতি ঘটান। কৃষকদের প্রতি আমাদের উপদেশ হল, জমিদারদের সঙ্গে তাদের যে চুক্তি হয়েছে তা লিখিত বা অলিখিত রীতি অনুসারে যে ভাবেই হোক না কেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। যদি কোথাও এরূপ চুক্তি যুক্তিসঙ্গত না হয়ে থাকে সেখানেও জমিদারদের পূর্বভাগে অবগত না করে কৃষকদের কোন

প্রকার বলপ্রয়োগ করা উচিত হবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে জমিদারদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা করতে প্রয়াসী হতে হবে।”

গান্ধিজী কখনো ধনবান শ্রেণীকে আঘাত করতে চান নি। এমন কি তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলনেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতি গান্ধিজীর কোন অনুরাগ ছিল না। সম্প্রতিকালে আলোচনা প্রসঙ্গে ধনবান-শ্রেণী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গান্ধিজী বলেন, যে হাঁস সোনার ডিম দেয় তাকে মেরে ফেলার মত মূর্খতা আর নেই। ধনী ও দরিদ্র, মালিক ও শ্রমিক, জমিদার ও প্রজা, প্রভু ও ভৃত্যদের মধ্যেকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক গঠনে গান্ধিজীর সমাধান সূত্র অতি সরল। মালিকপক্ষকে তাদের সম্পদের কিছু মাত্র ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা শুধুমাত্র ঘোষণা করবেন যে, তারা হলেন তাদের অধীনস্থদের ‘ট্রাস্টী’। এই ট্রাস্টীদের কোন লিখিত চুক্তিপত্রেরও দরকার নেই, এটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

৩

দেশের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধিজীর বিশ্লেষণে নূতনত্ব কিছু আছে কি? গান্ধিজীর অর্থনৈতিক তত্ত্বের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি আছে কি? সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ ও অস্পৃশ্য সমাজের সম্মুখে গান্ধীবাদ কতটা আশা ভরসা তুলে ধরতে পেরেছে? গান্ধীবাদ কি তাদের সম্মুখে উন্নতমানের জীবন, আনন্দ উচ্ছ্বলতায় ভরা জীবন, সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবন, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি এবং জীবনকে বিকসিত করার কোন প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে?

অর্থনৈতিক অব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধিজীর বিশ্লেষণে নূতন কিছু নেই। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতা সম্পর্কে তিনি যে সব অভিযোগ এনেছেন তার মধ্যেও নূতনত্ব কিছু নেই। তিনি অভিযোগে বলেছেন যে, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে দেশের অর্থনীতিকে কেন্দ্রীভূত করেছে। ব্যাংক এবং আর্থিক লেনদেন

ব্যবস্থা আরো কম লোকের হাতে দেশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে সীমাবদ্ধ করেছে। কলে-কারখানায় কাজ করার জন্য হাজার হাজার মাইল দূরের গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে শহরে জড় হচ্ছে এবং শোষিত হচ্ছে। যন্ত্র দানবের হাতে পড়ে এত মানুষ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে ও বিকলাঙ্গ হচ্ছে যার তুলনায় বড় বড় যুদ্ধক্ষেত্রও অনেক পিছনে পড়ে আছে। কলকারখানা অধ্যুষিত ঘিঞ্জি শহরগুলিতে দুরারোগ্য ব্যাধি ও দৈহিক অক্ষমতার প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে। বৃহৎ বৃহৎ ঘিঞ্জি শহরগুলিতে ধোঁয়া, ধুলা, হৈ-চৈ, দূষিত বায়ু, অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ, বস্তির সামাজিক বন্ধনহীন জীবন, অসামাজিক যৌন ক্রিয়াকর্ম, অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা মানবজীবনকে নরকের দ্বারপ্রান্তে এনে পৌঁছে দিয়েছে। এগুলি সবই পুরানো অভিযোগ। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নেই। বিগত শতাব্দীসমূহে রুশো, রাস্কিন, টলষ্টয় প্রভৃতিরা যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন গান্ধিজী তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

গান্ধীবাদের ভিত্তিই হল প্রাচীনকালের ধ্যানধারণা। এর নির্দেশ হল প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নেওয়া অর্থাৎ বন্যজীবনকে স্বাগত জানান। এর একমাত্র গুণ হল সরলতা। দেশের লক্ষ লক্ষ সরল প্রকৃতির মানুষ এর দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে। এসব কথা প্রচার করার মত সরল প্রকৃতির নির্বোধের অভাব এদেশে নাই। মানুষ তার স্বাভাবিক বিচার শক্তির দ্বারা প্রগতিশীল পন্থাকে অনুসর করে থাকে এবং যা উন্নতমানের জীবনের পথে বাধা বলে গণ্য হয় তাকে বর্জন করে থাকে।

গান্ধীবাদের অর্থনীতি খুবই বিভ্রান্তিকর। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বেশ কিছু খারাপ দিক রয়েছে। কিন্তু তাই বলে তা যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি বলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; কারণ এই সব ত্রুটি আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার ত্রুটি নয়। এই ত্রুটিগুলি হল প্রকৃতপক্ষে সমাজব্যবস্থার ত্রুটি, যাতে ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখা হয়েছে। যদি সমাজব্যবস্থার যথাযথ পরিবর্তন করা যায়, তবে ব্যক্তিগত স্বার্থের

পরিবর্তে যন্ত্রসভ্যতার সুফলগুলি জনসাধারণের স্বার্থে কাজে লাগান যাবে।

গান্ধীবাদে জনসাধারণের আশা করার কিছু নেই। গান্ধীবাদে সাধারণ মানুষকে পশুর ন্যায় গণ্য করা হয়েছে। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে পশুর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও মানুষের এমন কতকগুলি গুণ আছে যা অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। মানুষ মননশীল ও বিচারশীল প্রাণী। মানুষের বিচারশক্তি, চিন্তাশীলতা ও পর্যালোচনা শক্তি অন্যান্য প্রাণীর থেকে তাকে পৃথক করেছে। এইসব গুণাবলীর দ্বারা মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছে এবং তার নিজের মধ্যেকার পশুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই কারণে মানুষ প্রাণীজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।

এসব থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে পেঁছাতে পারি? সিদ্ধান্তটি হল, মানুষ তার দৈহিক পশুপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির পর মানসিক বৃত্তিগুলির অনুশীলন করে উন্নততর সমাজজীবন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হবে। তাহলে দেখা গেল যে, প্রাণীজগত থেকে মানুষকে পৃথক করেছে তার মানসিক বৃত্তির অনুশীলন বা তার সংস্কৃতি। অন্য প্রাণীর মধ্যে মানসিক বৃত্তির অনুশীলন দেখা যায় না। এটাই হল মানুষের আসল বৈশিষ্ট্য। তাই উন্নত সমাজজীবনের লক্ষ্য হল মানুষ যাতে তার মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের যথাযথ সুযোগ লাভ করতে পারে। কেবলমাত্র দৈহিক প্রয়োজনীয়তার পূর্তি মানব জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। মানুষ কি ভাবে তার সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারে?

তাই কি ব্যক্তিজীবনে, কি সমাজজীবনে শুধুমাত্র জীবনধারণ এবং যোগ্য জীবনযাপনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমেই মানুষকে জীবনধারণের জন্য প্রয়াসী হতে হবে এবং তারপরই তাকে সাংস্কৃতিক জীবনযাপনে প্রয়াসী হতে হবে। এই সাংস্কৃতিক জীবনযাপন কি ভাবে সম্ভব?

সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের জন্য মানুষের প্রয়োজন যথেষ্ট

অবকাশ। সাংস্কৃতিক জীবনযাপন তখনই সম্ভব হবে যখন সে প্রচুর পরিমানে অবকাশ পাবে। তাই সভ্য মানুষের জীবনে প্রধান সমস্যা হল, কি ভাবে প্রতিটি মানুষ তার জীবনে অবকাশ লাভ করবে? মানব জীবনে অবকাশের তাৎপর্য কি?

মানুষ তার দৈহিক প্রয়োজন মিটাবার জন্য কত কম সময় পরিশ্রম করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে সেটাই হল অবকাশ সৃষ্টির রহস্য। তাহলে কি ভাবে মানবজীবনে অবকাশ এনে দেওয়া যেতে পারে? অবকাশ তখনই সম্ভব যখন মানুষ তার জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভারকে কম সময়ে প্রস্তুত করতে পারবে। কি ভাবে কম সময়ে প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভার প্রস্তুত করা সম্ভব?

কেবলমাত্র যন্ত্রের সাহায্যেই মানুষ কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে তার প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভার প্রস্তুত করতে পারে। যন্ত্রের সহায়তা ছাড়া কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে তা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। তাই আধুনিক উন্নতমানের সভ্যতা সৃষ্টির পক্ষে যন্ত্র এক অপরিহার্য উপাদান। মানুষকে পশু জীবন থেকে মুক্ত করার অন্য কোন পথ নেই। যন্ত্রই মানুষের জীবনে যথেষ্ট পরিমাণে এনে দিতে এবং উন্নত মানের সাংস্কৃতিক জীবযাপনের সুযোগ করে দিতে পারে। তাই যিনি এই আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার বিরোধিতা করেন তিনি উন্নতমানের জীবনযাপনের তাৎপর্যটাই বুঝতে পারেন না।

গান্ধীবাদ সেই সমাজের পক্ষে উপযোগী যে সমাজ গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে জীবনযাপনে অনিচ্ছুক। যে সমাজে গণতান্ত্রিক জীবনবিমুখ তার পক্ষেই আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব। কোন গণতান্ত্রিক সমাজই আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার প্রতি মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক আদর্শবিহীন সমাজ চায় মুষ্টিমেয় মানুষের জীবনে অবকাশ ও সাংস্কৃতিক জীবন সীমাবদ্ধ থাকবে; আর বৃহত্তর মানব সমাজ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে জীবনযাপন করবে। গণতান্ত্রিক সমাজ চাইবে প্রতিটি নাগরিকের জীবনে অবকাশ ও সাংস্কৃতিক জীবন চর্চার

সুযোগ। এই বিশ্লেষণকে যদি আমরা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি তবে আমরা চাইব অধিকতর যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন এবং অধিকতর আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা। গান্ধীবাদে সাধারণ মানুষকে যৎকিঞ্চিত মজুরীর জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং পশুর ন্যায় জীবনযাপন করতে হবে। এক কথায় গান্ধীবাদ হল সাধারণ মানুষকে প্রাকৃতিক জীবনে ফিরে যাওয়ার, অর্ধনগ্ন অবস্থায় নোংরা ও দরিদ্রভাবে দিন যাপনের এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে অনন্তকাল পশুর মত জীবন অতিবাহিত করার আহ্বান।

ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য সমাজে যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে লোপ করা কোনদিন সম্ভব হবে কিনা বলা কঠিন। যুগ যুগ ধরে সমাজজীবনে ও অর্থনৈতিক জীবন-ধারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। দাসব্যবস্থার বিলোপ সাধন হয়েছে, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটেছে, বিজ্ঞানের সফল অভিযান দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সংবাদপত্র, সাধারণ জ্ঞান, বিশ্বব্যাপী চিন্তা-জগতের আদান-প্রদান, শিক্ষাজতের আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকতর হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও সমাজজীবনে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, শ্রমজীবী শ্রেণী ও সৌখিন শ্রেণীর পার্থক্য থেকে মানব-সমাজকে এখনো মুক্ত করা যায় নি।

গান্ধীবাদ কেবলমাত্র শ্রেণীপার্থক্য নিয়ে খুশী নয়। গান্ধীবাদ চায় একটা পাকাপাকি শ্রেণী কাঠামো তৈরী করতে। এই শ্রেণী কাঠামোর সঙ্গে একটা আর্থিক কাঠামো যুক্ত থাকবে এবং তাকে কোন ক্রমেই ভঙ্গ করা যাবে না। ফলে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ ও মালিক-শ্রমিক বিভাগটা একটা স্থায়ী সামাজিক কাঠামো হয়ে বিদ্যমান থাকবে। সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে এর চেয়ে ক্ষতিকর ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এই ব্যবস্থা উভয় শ্রেণীর পক্ষে একটা ভয়ানক অনিষ্টকর মনোভাব সৃষ্টি করে থাকে। সমাজজীবনে এমন কোন ক্ষেত্র থাকে না যেখানে উভয় শ্রেণীর মানুষ একত্রে মিলিত হতে পারে। তাদের মধ্যে কোথাও আভ্যন্তরিণ মেলামেশা, কিম্বা অভিজ্ঞতা বা মানসিক অনুভূতির লেনদেনের কোন সুযোগে থাকে না। এই

পার্থক্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতিকর মনোভাব গড়ে ওঠে তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর দ্বারা শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ নিজেদেরকে দাস বলে ভাবতে থাকে এবং তাদের মধ্যে একটা দাস মনোভাব গড়ে ওঠে।

এরূপ বৈষম্য ও পার্থক্যের ফলে শাসকশ্রেণীর মধ্যে একটা সমাজবিরোধী গোষ্ঠী-মনোভাব গড়ে ওঠে। তারা ভাবতে সুরু করে যে, তারা হলেন এমন একটা স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী যাদের স্বার্থ, এমন কি রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধেও রক্ষা করতে হবে। তার ফলে সংস্কৃতি হয়ে ওঠে বন্ধ্যা, তাদের শিল্প হয় প্রদর্শন-মূলক, তাদের ধনৈশ্বর্য হয় কেবল আড়ম্বরপূর্ণ এবং আচরণ হয়ে ওঠে খুঁতখুঁতে। প্রকৃতপক্ষে সমাজজীবনে এক দিকে দেখা যায় অত্যাচার, অহংকার, আড়ম্বর, একগুঁয়েমি, লোভ ও স্বার্থপরতা, অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্য, হীনমন্যতাবোধ, স্বাধীনতা-হীনতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষিত হতে পারে না। গান্ধীবাদ এই অবস্থার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করে না।

গান্ধীবাদ কেবলমাত্র শ্রেণী পার্থক্য বজায় রেখেই খুশী নয়; গান্ধীবাদ আরো বেশী কিছু চায়। যে সমাজ কাঠামো জরাজীর্ণ, শুষ্ক ও মৃতপ্রায় তাকে সজীব করে তুলতে চায় গান্ধীবাদ। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। গান্ধীবাদের কাছে প্রাচীন সমাজকাঠামো কেবলমাত্র অতীতের বিষয় নয়; গান্ধীবাদ তাকে আজও জীবন্ত করে রাখতে চায়।

গান্ধীবাদ 'ট্রাস্টিশিপের মতবাদ'কে সর্বরোগহর ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, যাতে ধনিকশ্রেণী গরীবদের অভিভাবক হিসাবে তাদের ধনসম্পদকে অক্ষত অবস্থায় রাখতে পারে। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত শ্রমজীবী শ্রেণীকে বঞ্চিত করার মত এত চমৎকার মতবাদ আর কি হতে পারে। ধনিক শ্রেণীর অপরিসীম ধনলিপ্সাকে বহাল তবিয়তে রক্ষা করার পক্ষে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, গান্ধিজী চান সমাজজীবন হবে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষে অশ্রুবর্ষণের

উপত্যকা। যে প্রাচীন সমাজকাঠামো অর্থবান শ্রেণীকে শ্রমপরায়ণ দরিদ্র শ্রেণীকে শোষণের অপ্রতিরোধ্য ক্ষেত্র করে রেখেছিল তাকে বজায় রাখার নূতন কৌশল হল এই 'ট্রাস্টিশিপের মতবাদ'।

গান্ধিজীর সামাজিক আদর্শ হল জাতিব্যবস্থা ও বর্ণব্যবস্থা বহাল রাখা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গান্ধিজীর সামাজিক আদর্শের সঙ্গে গণতন্ত্রের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে, বর্ণব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্র বিরোধী। গান্ধিজী যদিও জাতব্যবস্থাকে দারুণভাবে সমর্থন করেছেন, তথাপি তার মধ্যে কোন যুক্তিগ্রাহ্য উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় না। গান্ধিজী জাতব্যবস্থার সমর্থনে যে সব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তা হয় বালকোচিত, না হয় বাস্তবক্ষেত্রে অসত্য। এ সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি প্রথম যে তিনটি যুক্তি দেখিয়েছেন তা করুণারই উদ্রেক করে। তিনি বলেছেন যে, হিন্দুসমাজ আজও অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে; অথচ পৃথিবীর অন্য সব প্রাচীন সমাজ মুছে গেছে। একথা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। হিন্দু সমাজব্যবস্থা যে আজও টিকে আছে তার কারণ হল, যে সব বিদেশীরা ভারত শাসন করেছে তারা হিন্দুসমাজকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে চায় নি। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার মধ্যে কোন গৌরব নেই। দেখতে হবে তারা কি অবস্থায় বেঁচে আছে? যদি দেখা যেত যে, হিন্দুরা যুদ্ধ করে শত্রুকে পরাভূত করে বেঁচে আছে তাহলে গান্ধিজীর জাতব্যবস্থাকে সমর্থন করা যেত। কিন্তু ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দুরা আত্মসমর্পণ করে শত্রুদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে বেঁচে আছে। ইতিহাসে এও দেখা গেছে যে, কোন কোন জাতি হয়ত কখনো কখনো আত্মসমর্পণ করেছে; কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় থেকে তারা পরবর্তীকালে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ করে জয়ী হয়েছে। হিন্দুরা কিন্তু কখনো বিদেশীর বিরুদ্ধে প্রবল বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি, বা তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে বিদেশী শক্তির কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারে

নি। বিপরীতপক্ষে হিন্দুরা তাদের দাসত্বকে কিভাবে আরামদায়ক করা যায় সেই চেষ্টাই করেছে। তাই সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে, হিন্দুদের এই অসহায় অবস্থার জন্য তাদের জাতব্যবস্থাই দায়ী।

জাতব্যবস্থাকে সমর্থন করতে গিয়ে ৪র্থ অনুচ্ছেদে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে একথা বলা যায় না যে, জাতব্যবস্থা হল একমাত্র পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমাজে প্রাথমিক শিক্ষা ও বিচার-ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালিত হয়েছে ; বরং জাতব্যবস্থা এই দুটি ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জাতব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও তারা এই দুটি ক্ষেত্রের দায়িত্ব অনেক ভালভাবে পালন করেছে।

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে জাতব্যবস্থার কার্যকারিতার মতবাদ আজ-গুবী গল্প ছাড়া কিছু নয়। জন্মগত পেশার মতবাদ একটা অবাস্তব কল্পনামাত্র। গান্ধিজী একথা ভালই জানেন যে, তাঁর নিজস্ব প্রদেশ গুজরাটে একটি জাতও মিলিটারী ইউনিট হিসাবে গড়ে ওঠে নি। বর্তমান বিশ্বযুদ্ধেও এই মতবাদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বিগত বিশ্বযুদ্ধেও এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যদিও বৃটিশের এজেন্ট হিসাবে গান্ধিজী সারা গুজরাটে সেনা সংগ্রহের জন্য চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছেন। জাতব্যবস্থার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকায় প্রতিরক্ষার প্রতি আগ্রহশীল মানসিকতা কেবলমাত্র ক্ষাত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়।

৫ম ও ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ গান্ধিজী যে যুক্তির অবতারণা করেছেন, তা চিন্তাশীল মানুষের কাছে মূঢ়তারই নামান্তর। ৫নং অনুচ্ছেদে যে যুক্তি দেখান হয়েছে, তাকে যুক্তির পর্যায়েই আনা চলে না। এটা সত্য যে, পরিবার একটি আদর্শ ইউনিট। সেখানে পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা স্বাভাবিক, যদিও স্বপরিবারে বিবাহবিধি নিষিদ্ধ। বৈষ্ণব পরিবারে সকলে একত্রে খাওয়া দাওয়া না করলেও তাদের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসার কোন অভাব নেই। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় যে, ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিবাহব্যবস্থা ও একত্রে খাওয়া দাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই? এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, পারিবারিক সম্পর্কের মত শক্তিশালী বন্ধন

যেখানে আছে সেখানে একত্রে আহার বা বিবাহ সম্পর্কের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু জাতব্যবস্থার মধ্যে যেখানে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির কোন রক্তের সম্পর্ক থাকে না, সেখানে তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে পারস্পরিক বিবাহ বা একত্রে খাওয়া-দাওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। জাতি এবং পরিবার এক জিনিষ নয়। একটি পরিবারের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে তেমন কোন সম্পর্ক থাকে না। যারা অসবর্ণ বিবাহ বা একত্রে পান-ভোজনের বিরোধী, তারা বিষয়টিকে একটি আপেক্ষিক মূল্যমানের দৃষ্টি নিয়ে দেখে থাকেন। তারা সমাজের সামগ্রিক মূল্যমানের স্তরে বিচার করেন না। গান্ধিজীর ব্যাপারটাও তাই। গান্ধিজী বলেন, একত্রে খাওয়া-দাওয়া খারাপ এবং তার মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকেও তা গ্রহণযোগ্য নয় ; কারণ তার মতে খাওয়া-দাওয়া হল পায়খানা করার মত একটা নোংরা কাজ।

জাতব্যবস্থার সমর্থন অনেকে করেন। তারা একত্রে খাওয়া-দাওয়াকে সমর্থন করেন না। কিন্তু গান্ধিজীর মত খাওয়া-দাওয়া যে মলমূত্র ত্যাগের মত নোংরা কাজ, এমন কথা ইতিপূর্বে কারো কাছে শোনা যায় নি। আমার মনে হয় একথা শুনলে যে কোন গোঁড়া হিন্দুও বলবেন, 'ভগবান! গান্ধিজীর হাত থেকে আমাদের বাঁচান।' এর দ্বারা বোঝা যায় গান্ধিজী কি ধরণের গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামীর কোন পর্যায়ে তিনি পেঁছেছেন? আমার মনে হয়, কোন গুহা-মানবও এই ধরণের যুক্তির ব্যবহার করত না। মস্তিষ্কে বিকৃতি না ঘটলে এরূপ যুক্তির অবতারণা কোন মানুষই করতে পারে না।

৭ম অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন যে, জাতব্যবস্থা মানুষের নৈতিক মানের ক্ষেত্রে চমৎকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এনেছে। একথাও কতটা যুক্তিযুক্ত তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। একথা ঠিক যে, মানুষের নারীঘটিত আকাঙ্ক্ষাকে জাতব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমানে নিয়ন্ত্রিত করেছে। একথাও স্বীকার্য যে, জাতব্যবস্থা অন্য জাতির বাড়ীতে রান্না করা খাবার খাওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ এনেছে।

যদি প্রয়োজনকে অস্বীকার করে খাওয়া-দাওয়ার নিয়ন্ত্রণ করাকে নৈতিক মান বলে গণ্য করা হয়, তবে জাতব্যবস্থাকে নৈতিক মান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু গান্ধিজী কি লক্ষ্য করেছেন যে, জাতব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তির পক্ষে তার নিজের জাতের মধ্যে শত শত নারীকে বিবাহ করার, অথবা শত শত বারবণিতা উপভোগ করার কোন বাধা জাতব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে নি ? তাহলে একে কি আমরা নৈতিক মানের উচ্চ আদর্শ বলে গ্রহণ করতে পারি ?

৮ম অনুচ্ছেদে যে যুক্তি উপস্থাপনা করা হয়েছে তা আরো গুরুতর। বংশানুক্রমিক পেশা ভালও হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। অনেকে একে সমর্থন করেছেন, আবার অনেকে এর বিরোধিতা করেছেন। তাহলে একে সাধারণ নীতি হিসাবে কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে ? কেন একে বাধ্যতামূলক করা হল ? ইউরোপে জন্মগত পেশাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। পেশাকে ব্যক্তিগত রুচির উপর ছেড়ে দিয়েছে। কেউ জন্মগত পেশা গ্রহণ করেছে, কেউ করে নি। একথা কি জোর দিয়ে বলা যায় যে, বাধ্যতামূলক জন্মগত পেশা ভাল ফল প্রকাশ করে ? যদি এই দুয়ের মধ্যে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ভারতের চেয়ে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নত।

মানুষের পেশা নিয়ে তাদের উপর যেভাবে জাতিগত নামকরণ করা হয়েছে তা কৃত্রিম বলেই মনে হয়। পেশা অনুসারে কোন মানুষের নামকরণ করার কোন বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? পেশা অনুসারে মানুষের নামকরণ তুলে দিলে কোন অসুবিধা দেখা দেবে বলে মনে হয় না। বরং ভারতে দেখা যাচ্ছে যে, জন্মগত পেশা হিসাবে যে সব জাতির নামকরণ করা হয়েছে তাদের বেশীর ভাগই জাতিগত পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করছে না। অনেক ব্রাহ্মণ জুতার ব্যবসা করছে, অথচ তাদের চামার নামে অভিহিত করা হচ্ছে না। অনেক চামার সরকারী উচ্চপদে চাকুরীরত। তাতে কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তাহলে পেশাগত নামকরণ অর্থহীন বলে মনে হয় না কি ?

প্রকৃতপক্ষে পেশাটাই মানুষের পক্ষে প্রয়োজন, তার নামটা মোটেই অর্থবহ নয়।

জাতব্যবস্থার সপক্ষে ৯ম অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত গান্ধিজীর যুক্তি একেবারে অর্থহীন। এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মনুস্মৃতি যারা পড়েছেন তারাও স্বীকার করবেন না যে, জাতব্যবস্থা একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থা। মনুস্মৃতি থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, জাতব্যবস্থাকে কঠোর সামাজিক শাস্তির ভয় দেখিয়ে চালু করা হয়েছিল। জাতব্যবস্থা তিনটি কারণের উপর নির্ভর করে টিকে আছে। যথা—(১) জনগণের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে; (২) জনগণকে শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে; (৩) সম্পদের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় জাতব্যবস্থাকে মানব সমাজের স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলা তো দূরের কথা—প্রকৃতপক্ষে এটা শাসকশ্রেণী জোর করে শাসিতদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

গান্ধিজী তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিকে জোরদার করতে গিয়ে হঠাৎ জাতব্যবস্থা থেকে বর্ণব্যবস্থায় ফিরে গেছেন। এতেও কিন্তু গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আদর্শ বিরোধিতার অভিযোগ খণ্ডিত হয় না। প্রথমতঃ বর্ণব্যবস্থা থেকে জাতব্যবস্থার উৎপত্তি। জাতব্যবস্থা মতবাদ হিসাবে যতটা ক্ষতিকর, বর্ণব্যবস্থা তার চেয়ে কোন অংশে কম ক্ষতিকর নয়। উভয় ব্যবস্থাই সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গির দিক থেকে দুষ্ট ব্যবস্থা। দুয়ের মধ্যে আসলে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। বৌদ্ধরা বর্ণব্যবস্থার কঠোর নিন্দা করেছেন। তারা এতে বিশ্বাসী নয়। বৌদ্ধদের অভিযোগের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুরা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থিত করতে পারে নি। তাদের একমাত্র যুক্তি হল বেদ অভ্রান্ত; তাই বেদে যখন বর্ণব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তখন তা অভ্রান্ত।

বর্ণব্যবস্থা যে আজও টিকে আছে তার প্রধান কারণ হল ভগবদ্‌গীতা। ভগবদ্‌গীতায় বর্ণব্যবস্থার একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে বর্ণব্যবস্থা জন্মগত নয়,

তা হবে মানুষের গুণ ও কর্ম অনুসারে। বর্ণব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য গীতা এখানে সাংখ্য দর্শনকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র সংস্রব নেই। ভগবদ্‌-গীতা প্রকৃত পক্ষে গুণ-কর্মের নামে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বর্ণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে।

ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যার দুটি ভাল দিক আছে। প্রথমতঃ তা বর্ণকে জন্মভিত্তিক বলে অভিহিত করে নি। গীতা বর্ণকে মানুষের গুণ ও কর্মের ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে। গীতা একথা বলে নি যে, পুত্রকে পিতার পেশা অবলম্বন করতে হবে। পিতা তার গুণ ও প্রবণতা অনুসারে পেশা গ্রহণ করবে এবং পুত্র তার নিজস্ব গুণ ও প্রবণতা অনুসারে পেশা অবলম্বন করবে। কিন্তু গান্ধিজী গীতার ব্যাখ্যা অস্বীকার করে আর একটি ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছেন। গোঁড়াতে বর্ণব্যবস্থায় বর্ণের সঙ্গে পেশার যোগ ছিল না। পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল জাতি। অর্থাৎ পেশা অনুসারে হিন্দুদের জাতি নির্ণীত হত। গান্ধিজী এবার নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে, বর্ণ অনুসারে মানুষ পেশা গ্রহণ করবে অর্থাৎ জাতি ও বর্ণ এই দুটিকেই গান্ধিজী সমার্থক করে ফেললেন এবং তিনি এটাকে একটা বৈপ্লবিক দর্শন নামে অভিহিত করলেন। গান্ধিজী সারাজীবন চাতুরীপূর্ণ ব্যবস্থা সৃষ্টিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। রাহু-কেতুর মত তিনি ছিলেন চির অকালপক্ক। চিন্তার দিক থেকে তিনি কোন দিনই পরিপক্কতা লাভ করতে বা জাতি মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

গান্ধিজী আর্থ-সামাজিক বিষয়ে এমনভাবে বক্তব্য রেখেছেন যাতে মনে হবে, তিনি একজন বৈপ্লবিক ব্যক্তিত্ব। যারা গান্ধীবাদ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন তারা যেন একথা মনে করে প্রতারিত না হন যে, তিনি গণতন্ত্রের সমর্থক ও পুঁজিবাদের শত্রু। গান্ধী-বাদ কোন অর্থেই বৈপ্লবিক মতবাদ নয়। গান্ধীবাদ আসলে একটি উন্নতমানের প্রতিক্রিয়াশীলতা। ভারতীয় জীবন দর্শনের পরি-প্রেক্ষিতে তা হল আদিম যুগে প্রত্যাবর্তনের জন্য একটা উজ্জ্বল পাথেয়। গান্ধীবাদ ভারতের মৃতপ্রায় প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-

ধারণাকে পুনর্জীবন প্রদান করেছে।

গান্ধীবাদ আসলে একটা কূটাভাস (Paradox)। এতে বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে চাওয়া হয়েছে বটে; কিন্তু এর আসল তাৎপর্য হল, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোর দিক-পরিবর্তন। এর দ্বারা তিনি চেয়েছেন ভারতের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন—যাতে সমাজের একটা ক্ষুদ্র শ্রেণী উত্তরাধিকার সূত্রে দেশের বৃহত্তর শ্রেণীকে পদানত করে রাখতে পারে। গান্ধিজীর এই কূটাভাসের লক্ষ্য হল, কৌশলে দেশের হিন্দু সমাজের—তারা গোঁড়া বা অগোঁড়া যাই হোন না কেন—স্বরাজের নামে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করা। এই পরিস্থিতিতে আমরা কি গান্ধিজীকে একজন সৎ ও যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ বলে মনে করতে পারি? গান্ধীবাদকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাব, যা আজ পর্যন্ত উদ্ঘাটন করার কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হয় নি। গান্ধীবাদ মার্কসবাদের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য কিনা তা অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন। তাহলেও এ বিষয়ে খানিকটা বিশ্লেষণ করে দেখা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি।

প্রথম বৈশিষ্ট্যটা হল গান্ধীবাদ এমন একটা দর্শন, যাতে যারা সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী তারা তা রক্ষা করার যুক্তি খুঁজে পাবে এবং যারা সম্পদ ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত তাদের তা অর্জন থেকে বিরত করে রাখা যাবে। ধর্মঘট সম্পর্কে গান্ধিজীর চিন্তা-ধারা নিয়ে যারা পর্যালোচনা করেন নি তারা হয়ত ভাববেন, গান্ধিজীর জাতব্যবস্থার প্রতি নিষ্ঠা এবং গরীব শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ধনবান শ্রেণীর অভিভাবকত্ব বা 'ট্রাস্টিশিপ'-এর ধারণা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা। এটা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা, কিম্বা একটা সুচিন্তিত অভিপ্রায়ের কলাকৌশল তা আমাদের যুক্তি দিয়া বিচার করে দেখতে হবে। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, গান্ধীবাদ হল দেশের ধনিক শ্রেণী বা পরশ্রমের উপর নির্ভরশীল বিলাসী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার মতবাদ।

গান্ধীবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তা এমন একটা প্রতারণা-

পূর্ণ প্রচারব্যবস্থা, যাতে সাধারণ মানুষ তাদের বঞ্চনামূলক ব্যবস্থাকে সৌভাগ্য বলে মনে করে। দু'একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে।

হিন্দুধর্মের একটা পবিত্র বিধান হল, শূদ্রদের সম্পদ আহরণের উপর বিধিনিষেধ। এর দ্বারা তাদের উপর দারিদ্র্য এমনভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যার নজীর সারা বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গান্ধীবাদ এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছে। সম্পদহীন হওয়াকে শূদ্রদের পক্ষে আশীর্বাদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে গান্ধিজীর নিজের কথা উদ্ধৃত করা হল। তাঁর লেখা 'বর্ণব্যবস্থা' গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় গান্ধিজী বলেছেন ঃ—

"শূদ্রসমাজের ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছে উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা। তাদের কোন সম্পদ থাকবে না, এমন কি সম্পদ অর্জনের কোন আকাঙ্ক্ষাও তাদের মনে থাকবে না। এরাই হাজার হাজার বার প্রণিপাতের যোগ্য······। এদের উপরই দেবতাদের পুষ্পাশিস বর্ষিত হবে।"

মেথরদের সম্পর্কে গান্ধীবাদের আরো একটা চমৎকার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুধর্মের পবিত্র বিধিতে বলা হয়েছে যে, মেথরদের বংশধরগণ মেথরের কার্যকেই তাদের পবিত্র পেশা হিসাবে গ্রহণ করবে। হিন্দুধর্মের নীতি অনুসারে সাফাই কার্য মেথরদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, এটা তাদের উপর বাধ্যতামূলক পেশা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে গান্ধীবাদী অভিমত কি? গান্ধীবাদ বলেছে সাফাই কার্য মেথরদের পক্ষে সমাজসেবার মহান নিদর্শন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার ১৯২১ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের একটি সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা বিবৃত করা হয়েছে। এখানে তার থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ—

"আমি মোক্ষ চাই না। আমি পুনর্জন্ম চাই না। কিন্তু আমার যদি পুনর্জন্ম হয় তবে আমি যেন অস্পৃশ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করি, যাতে আমি অস্পৃশ্যদের জীবনের দুঃখ, যাতনা ও অত্যাচারের অংশগ্রহণ করতে পারি এবং সেই শোচনীয় অবস্থা থেকে

নিজেকে ও অস্পৃশ্য সমাজকে মুক্ত করার ব্রত গ্রহণ করতে পারি। তাই আমার প্রার্থনা, যদি আমাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতেই হয় তবে আমি যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হয়ে নয়, অতিশূদ্র হয়ে জন্মাই।

"সাফাই কার্যকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি। আমার আশ্রমে ১৮ বছরের একজন ব্রাহ্মণ সন্তান নিজহাতে সাফাই কার্য করে কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে জীবনযাপন করতে হয় তার শিক্ষা দেয়। বালকটি কোন সমাজ সংস্কারক নয়। গোঁড়া হিন্দু পরিবারে তার জন্ম। তার বিশ্বাস সে যদি মেথরের কাজ সুন্দরভাবে না করতে পারে, তবে তার জীবনে পূর্ণতা আসবে না। তাই সে আশ্রমের সাফাই কার্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে এরূপ একটা নিদর্শন সৃষ্টি করতে চায়—'তোমরা এটা মনে করবে যে, তোমরা হিন্দু সমাজকে পরিচ্ছন্ন করছ'।

এর থেকে আমরা স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছি যে, গান্ধিজী হিন্দু সমাজের একটা শ্রেণীকে নোংরা কাজের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে কিরূপ সুন্দরভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে গেছেন। অস্পৃশ্য মেথরদের কাছে একথা বলার কি কোন যুক্তি আছে যে, ব্রাহ্মণ সন্তানও হৃষ্টচিত্তে সাফাই কার্য করতে ইচ্ছুক? একজন ব্রাহ্মণ সন্তান সাফাই কার্য করলেও সে কখনো সমাজে অস্পৃশ্য বলে গণ্য হবে না। আবার একজন মেথরের সন্তান সাফাইকার্য না করলেও হিন্দুসমাজে তাকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হবে। ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে কাজ দেখে কাউকে মেথর বলা হয় না। পেশা হিসাবে যে কাজই করা হোক না কেন, মেথর পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই তাকে অস্পৃশ্য মেথর বলে মনে করা হয়ে থাকে।

যদি গান্ধীবাদে একথা বলা হত যে, সাফাই কাজ একটা পবিত্র পেশা এবং এটা সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য তাহলে আমরা তার মধ্যে একটা মহৎ আদর্শ খুঁজে পেতাম। কিন্তু গান্ধিজী কেবলমাত্র অস্পৃশ্য মেথরদের কাছেই এ বক্তব্য রেখে পিতৃপুরুষের পেশা সম্পর্কে তাদের উৎসাহিত করছেন কেন? অথচ দেখা যাচ্ছে যদি কোন মেথর সন্তান সাফাইকার্য করতে অস্বীকার করে, হিন্দু

শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাকে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। গান্ধীবাদীরা তো তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাচ্ছে না।

গান্ধিজী শূদ্র সমাজের কাছে দারিদ্র্যকে পবিত্র আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছেন। যদি গান্ধিজী কেবলমাত্র শূদ্র সমাজের পক্ষে নয়, সকলের পক্ষেই দারিদ্র্যকে একটা পবিত্র নীতি হিসাবে প্রচার করতেন, তাহলেও বলতে হবে এটা একটা ভ্রান্ত নীতি। কেন গান্ধিজী কেবলমাত্র শূদ্র ও অস্পৃশ্য সমাজের জন্য দারিদ্র্যকে পবিত্র নীতি বলে ঘোষণা করলেন ?

দারিদ্র্যকে কেবলমাত্র শূদ্রদের পক্ষে মহত্তর বলে প্রচার করা এবং সাফাইকার্য কেবলমাত্র মেথরদের পক্ষে পবিত্র কাজ বলে ঘোষণা করা গান্ধিজীর পক্ষে শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে একটা তামাসা নয় কি ? সাফাই কাজকে শান্তচিত্তে এবং হৃষ্টচিত্তে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য অসহায় অস্পৃশ্য মেথরদেরকে তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন, তাকে কোন মহৎ নীতি হিসাবে মেনে নেওয়া যায় কি ?

সমালোচনা না করেও গান্ধীবাদের কলাকৌশল সম্পর্কে একথা বলা চলে যে, তিনি নিপীড়িত মানুষদের কাছে তাদের নিপীড়নকে একটা দারুণ সুযোগ লাভ হিসাবে বর্ণনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যদি কোন মতবাদ ধর্মকে আফিমের মত ব্যবহার করে বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মানুষদের কাছে বঞ্চনা ও অত্যাচারকে একটা মহান আদর্শ হিসাবে তুলে ধরতে চায়, তবে সেই মতবাদটি হল গান্ধীবাদ। শেক্সপীয়ারের ভাষায় বলা যেতে পারে—'বিভ্রান্তি ও চাতুর্য ! তোমাদের অপর নাম হল গান্ধীবাদ।"

৪

এই হচ্ছে গান্ধীবাদ। গান্ধীবাদ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি আর একটি পাল্টা প্রশ্ন করা যায় যে, গান্ধীবাদ ভারতের আইন হিসাবে গৃহীত হলে অস্পৃশ্যদের অবস্থা কিরূপ হবে ? শূদ্রদের তুলনায় তাদের অবস্থা বা কিরূপ হবে ? গান্ধীবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে এদের অবস্থা কিরূপ হবে সে সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিত

আলোচনা হয়েছে। একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, সেখানে অস্পৃশ্য ও শূদ্র সমাজ অধিকারহীন জনসমাজে পরিণত হবে এবং অস্পৃশ্যদের অবস্থা শূদ্রদের তুলনায় অধিকতর খারাপ হবে; কারণ অধিকারহীন শূদ্র সমাজ এবং সর্বঅধিকার থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িত বনজঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজের অবস্থানও অস্পৃশ্যদের চেয়ে সামাজিকভাবে উচুতে। ওরা নিজেদেরকে অস্পৃশ্যদের চেয়ে উন্নত মনে না করলেও সবর্ণ হিন্দুরা তাদেরকে অস্পৃশ্যদের থেকে উচুতে স্থান দিয়েছে। কাজেই অস্পৃশ্যরা চিরকালের মত গান্ধীবাদী শাসন ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হতে থাকবে। সুযোগলাভের ক্ষেত্রে তারা থাকবে সকলের পিছনে, আর দুর্যোগের ক্ষেত্রে তাদেরই সর্বাগ্রে প্রাণ দিতে হবে।

অস্পৃশ্যদের এই চিরকালের দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ কোন উপশম ঘটাতে পারবে কি? গান্ধীবাদ ঘোষণা করেছে যে, হিন্দু-সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতাকে অপসারণ করা হবে। এটাকেই গান্ধী-বাদের সবচেয়ে মহৎ নীতি বলে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এর রূপায়ণের সম্ভাবনা আছে কি? গান্ধীবাদে অস্পৃশ্যতা-বিরোধিতার বিচার করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে গান্ধীবাদের কর্মসূচীর মধ্যে তার সুযোগ কতটা রয়েছে? এর অর্থ কি সবর্ণ হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করলে কিছু মনে করবে না? এর অর্থ কি অস্পৃশ্যদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে যে সব বাধা-নিষেধ আছে তা দূরীভূত হবে? এই দুটি প্রশ্নকে আলাদাভাবে বিচার করে দেখা যেতে পারে।

প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায় যে, গান্ধিজী একথা কখনো বলেন নি যে, অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করার পর হিন্দুদের স্নান করে শুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করার পর যদি স্নানই করতে হয়, তা হলে অস্পৃশ্যতা দূর হল কি করে? অস্পৃশ্যতার মূল কথাই হল অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করলে হিন্দুদের স্নান করে শুদ্ধ হতে হবে। তা যদি চলতে থাকে তা হলে একথা কি বলা চলে যে, অস্পৃশ্যদের

হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হল ? গান্ধিজী একথা কখনো বলেন নি যে, হিন্দুরা ও অস্পৃশ্যরা একত্রে খাওয়া-দাওয়া করবে এবং তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক করা যেতে পারবে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্পর্কে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার ১৯২৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় তিনি যেটা বলেছিলেন তা হল ঃ 'অস্পৃশ্যদের শূদ্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদের কোন আলাদা শ্রেণী থাকবে না'। এর বেশী কিছু নির্দেশ তিনি দেন নি।

গান্ধিজী একথা ভালই জানেন যে, শূদ্রেরা অস্পৃশ্যদের কখনো তাদের বর্ণভুক্ত বলে মেনে নেবে না। এজন্য গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের জন্য একটা আলাদা নাম স্থির করেন। এই নূতন নামটির দ্বারা গান্ধিজী এক ঢিলে দুই পাখী মারার ব্যবস্থা করলেন। গান্ধিজী নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, শূদ্রদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের মেলানো যাবে না। তাই তাদের একটা নূতন নাম অর্থাৎ 'হরিজন' আখ্যা দিয়ে মিলন তত্ত্বটাকে চিরকালের মত পৃথক করে দিলেন। ফলে তিনি শূদ্র সমাজেরও অপ্রীতিভাজন হলেন না।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক। ধরা যাক গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের শিক্ষালাভের বাধা দূর করতে সচেষ্ট হলেন এবং তাদের জন্য সাধারণ শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এসব শিখেই বা তাদের কি লাভ ? তারা কি তাদের পছন্দ মত জীবিকা গ্রহণ করতে পারবে ? তারা কি আইনজীবী, চিকিৎসক অথবা ইঞ্জিনীয়ার হতে পারবে ? এসব প্রশ্নের ক্ষেত্রে গান্ধিজী নীরব। এ বিষয়ে উল্লিখিত গ্রন্থের ২৭৫-৭৭ পৃষ্ঠায় তাঁর অভিমত দ্রষ্টব্য।

অস্পৃশ্যদের তাদের পূর্বপুরুষের পেশা গ্রহণ করতে হবে। গান্ধিজীর অভিমত অনুসারে, একবার যে ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেছে তা ভাল হোক, বা মন্দ হোক তার পরিবর্তন করা চলে না। সুতরাং গান্ধীবাদ অনুসারে মেথরের পুত্রকে চিরকাল মেথরের কাজই করতে হবে। তা যদি হয় তবে অস্পৃশ্যদের লেখাপড়া শিখে কি লাভ ? শাস্ত্রের মাধ্যমে অস্পৃশ্যদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। এসব এখন তাদের গা-সহা হয়ে গেছে।

কিন্তু গান্ধীবাদের নীতি অনুসারে অস্পৃশ্যদের যদি লেখাপড়া শিখেও সাফাই কাজই করতে হয় তা কি তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের পর্যায়ে পড়বে না ? গান্ধীবাদের আহ্বান অস্পৃশ্যদের জীবনে আরো বেশী দুর্যোগ ডেকে আনবে না কি ? অতএব গান্ধীবাদে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের যে তত্ত্ব রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে একটা মস্ত বড় ধাপ্পা। এর মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই।

৫

তাহলে এবার দেখা যাক, গান্ধীবাদে এমন আর কিছু আছে কিনা, যার মাধ্যমে অস্পৃশ্যরা তাদের মুক্তিসূত্র খুঁজে পেতে পারে ? অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিভ্রান্তিকর প্রস্তাব বাদ দিলে গান্ধীবাদ প্রকৃতপক্ষে গোঁড়া আগ্রাসী হিন্দু মতবাদের একটি নূতন সংস্করণ মাত্র। হিন্দু সনাতনপন্থী মতবাদে যা আছে তার সবই গান্ধীবাদে বিদ্যমান। হিন্দুমতবাদে জাতি বিভাগ রয়েছে ; গান্ধীবাদেও তা স্বীকৃত। হিন্দুমতবাদে পেশাকে বংশানুক্রমিক করা হয়েছে ; গান্ধীবাদও তা স্বীকার করে নিয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে গরুকে দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছে ; গান্ধীবাদেও ত মেনে নেওয়া হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করা হয়েছে ; গান্ধীবাদেও পূর্বজন্মের কর্মফলকে এজন্মের সুখ-দুঃখের কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুমতবাদে শাস্ত্রের কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য ; গান্ধীবাদেও তাই। হিন্দুরা অবতারবাদী ; গান্ধীবাদেও অবতারবাদ স্বীকৃত। হিন্দুধর্ম মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ; গান্ধীবাদও তা অনুসরণ করেছে। এই প্রসঙ্গে ১৯২১ সালের ৬ অক্টোবরের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধিজীর লেখা দ্রষ্টব্য।

গান্ধীবাদের অন্যতম কাজ হল, হিন্দুমতবাদকে সমর্থন করার জন্য একটি দার্শনিক ভিত্তি প্রস্তুত করা। হিন্দুমতবাদ হল কতগুলি যুক্তিহীন ও প্রাণহীন প্রথা ও বিধি। গান্ধীবাদে এমন কতকগুলি দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে হিন্দুধর্মের নিষ্ঠুর প্রথাসমূহকে একটা মসৃণ ও আপাতযুক্তিগ্রাহ্য আকর্ষণীয় রূপ দেওয়া হয়েছে। হিন্দু মতবাদের

নিষ্ঠুরতাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য গান্ধীবাদ কি পন্থা অবলম্বন করেছে ? এজন্য গান্ধীবাদ এই কথাটি জোর দিয়ে বলেছে—'হিন্দুমতবাদ খুব চমৎকার এবং তার সব কিছুই জনগণের কল্যাণের জন্য তৈরী হয়েছে।'

যারা ভল্টেয়ারের 'ক্যাণ্ডিড' পড়েছেন তারা একথা বুঝতে পারবেন যে, এগুলি হল মাস্টার প্যাংগিলসের দর্শন, যাকে ভল্টেয়ার তীব্রভাষায় বিদ্রূপ করেছেন। হিন্দুরা গান্ধিজীর ব্যাখ্যাতেই খুশী। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, এর দ্বারা হিন্দুসমাজের কোনই উপকার হয় নি। রাধাকৃষ্ণন গান্ধিজীকে খুশী করার জন্য হোক বা হিন্দুমতবাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই হোক এজন্য গান্ধিজীকে 'মর্তের ভগবান' নামে অভিহিত করেছেন। একথা অস্পৃশ্যদের কাছে কি অর্থ বহন করছে ? তাদের কাছে এর অর্থ হল—'তথাকথিত ভগবান গান্ধী এসেছেন অস্পৃশ্য সমাজকে সান্ত্বনা দিতে। তিনি হিন্দুদের ভারতকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন—যাতে হিন্দুরা জাতব্যবস্থার মূল নীতিগুলি ঠিকমত মেনে চলে।'

তিনি অস্পৃশ্যদের বলেছেন, "আমি জাতব্যবস্থার বিধি-বিধান সার্থকভাবে রূপায়ণ করতে চাই। আমি এই সব বিধি-নিষেধের একটুও এদিক ওদিক করতে রাজী নই।"

গান্ধীবাদের কাছে অস্পৃশ্যরা কি আশা পোষণ করতে পারে ? সত্য কথা বলতে গেলে হিন্দু মতবাদ অস্পৃশ্যদের কাছে একটা ভয়ংকর মতবাদ। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের পবিত্র ও অভ্রান্ত বিধানসমূহ জাতব্যবস্থার লৌহকঠিন প্রাচীর, কর্মফলের হৃদয়হীন বিধান, জন্মসূত্রে সামাজিক অবস্থানের অনড় কাঠামো, অস্পৃশ্য সমাজের উপর বঞ্চনা ও নির্যাতনকে চিরস্থায়ী করে রেখেছে। অস্পৃশ্যদের উপর হিন্দুধর্মের এইসব নির্যাতনমূলক বিধি-ব্যবস্থার সামান্যতম পরিবর্তন ব্যতিরেকেই গান্ধীবাদে তা পুরোপুরি-ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাহলে অস্পৃশ্যরা কি ভাবে গান্ধী-বাদকে তাদের মুক্তির স্বর্গ বলে মনে করতে পারে ? গান্ধীবাদ থেকে শত হস্ত দূরে থাকা ব্যতীত অস্পৃশ্যদের সম্মুখে আর কোন

পথ খোলা নেই।

যারা গান্ধীবাদের সমর্থক তারা দুটি জিনিষ ভুলে যাচ্ছেন। গান্ধিজী যে কথাটি বলতে চাইছেন তা হল, তিনি শুধু বলেছেন যে, জাতব্যবস্থা বর্তমান যুগে চলতে পারে না। গান্ধিজী কখনো একথা বলেন নি যে, জাতব্যবস্থা একটা ক্ষতিকর মতাদর্শ। তিনি কখনো জাতব্যবস্থাকে একটা অভিশাপ বলে মনে করেন নি। তিনি এখনও বর্ণব্যবস্থার সমর্থক। বর্ণব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে জাত-ব্যবস্থারই নামান্তর। বর্ণব্যবস্থার মধ্যে জাতব্যবস্থার সমস্ত কুফলগুলি বিদ্যমান। তাই একথা রীতিমত জোর দিয়েই বলা চলে যে, যুগের কষ্টিপাথরে বিচার করলে গান্ধীবাদ ধোপে টিকবে না।

গান্ধিজী তাঁর গান্ধীবাদের মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারেন নি। তাই গান্ধীবাদকে এখনো পর্যন্ত অস্পৃশ্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করার কোন কারণ ঘটে নি। অস্পৃশ্যরা যুক্তিসঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন করতে পারে —'হায় গান্ধিজী! তুমি কি এখনো আমাদের মুক্তিদাতা হিসাবে পরিচিত হতে চাও?'

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনীর গ্রন্থসমূহ

১।	বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা ডঃ আম্বেদকর	৪০.০০
২।	ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৬.০০
৩।	ভারতরত্ন আম্বেদকর (স্কুলপাঠ্যের উপযোগী)	১২.০০
৪।	বুদ্ধ-বুক (ডঃ আম্বেদকরের বাণী সংগ্রহ)	৬.০০
৫।	জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি (অনুঃ)—১৫.০০ ; ৬। ভারতের জাতিসমূহ (অনুঃ)	৪.০০
৭।	কংগ্রেস ও গান্ধিজী অস্পৃশ্যে জন্য কি করেছেন ? (অনুবাদ)	৭৫.০০
৮।	রাণাডে গান্ধী এবং জিন্না (অনুবাদ)—৮.০০ ; ৯। আম্বেদকরবাদ	৪.০০
১০।	অস্পৃশ্য সমাজের মুক্তি ও গান্ধিজী (অনুবাদ)	৬.০০
১১।	ডঃ আম্বেদকরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা	৪.০০
১২।	সমাজ সংস্কার সম্পর্কে ডঃ আম্বেদকর	২.৫০
১৩।	পুণাচুক্তি ঃ পটভূমি ও ফলশ্রুতি (অনুবাদ)—৬.০০ ; ১৪। ব্রাহ্মণ্যবাদ	৬.০০
১৫।	দলিতবাদ, বামসেফ ও ডি. এস. ফোর	৫.০০
১৬।	মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট (সংক্ষিপ্ত) ; নূতন সংস্করণ	২.৫০ / ৫.০০
১৭।	৮ খন্ডে আম্বেদকর রচনাবলী (অনুবাদ) ; প্রতি খন্ড ৩৫.০০	৯০.০০
১৮।	রাষ্ট্র এবং সংখ্যালঘু (অনুবাদ) ১০.০০ ; ১৯। অভিযান (কাব্যগ্রন্থ)	১০.০০
২০।	গোমাংসপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ কেন নিরামিষভোজী হল ? (অনুবাদ)	৬.০০
২১।	সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ঃ পাকিস্তান এবং লোকবিনিময় (অনুবাদ)	৫.০০
২২।	আম্বেদকরের দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোকে আর্যীকরণ বনাম সংরক্ষণ	৫.০০
২৩।	শূদ্র এবং প্রতিবিপ্লব (অনুবাদ) ৩.০০ ; ২৪। নারী এবং প্রতিবিপ্লব (অনুঃ)	৩.০০
২৫।	বুদ্ধ এবং তার গীতা (অনুঃ) ৫.০০; ২৬। অস্পৃশ্যদের মৌলিক সমস্যা (অনুঃ)	৪.০০
২৭।	পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাবের জনক ডঃ আম্বেদকর (অনুবাদ)	৮.০০
২৮।	বাংলার দলিত সাহিত্য ও তার গতিপ্রকৃতি	২.০০
২৯।	বাংলাভাষায় বিবাহ পদ্ধতি ৪.০০; ৩০। তফসিলীরা গান্ধিজী থেকে সাবধান	৩.০০
৩১।	বাংলাভাষায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও মরণোত্তর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পদ্ধতি	৫.০০
৩২।	মুক্তিদূত কাশীরাম—৫.০০ ; ৩৩। একলব্যের গুরুদক্ষিণা (নাটিকা)	৫.০০
৩৪।	হিন্দুধর্মের দর্শন (অনুবাদ)—১২.০০; ৩৫। ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্য (অনুঃ)	৬.০০
৩৬।	সাম্প্রদায়িক অচলাবস্থা ও তার সমাধানের পথ (অনুবাদ)	৪.০০
৩৭।	সংরক্ষণ ঃ অংশগ্রহণের বিষয় ৬.০০; ৩৮। গান্ধীবাদঃ তফসিলীদের মৃত্যুদন্ড	৬.০০
৩৯।	গোলটেবিল বৈঠক ও গান্ধিজীর ষড়যন্ত্র ১০.০০; ৪০। এই দেশ এই সমাজ	৬.০০
৪১।	বাবাসাহেব আম্বেদকর (রঙ্গীন)—১২.০০ ; ৪২। মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ	১০.০০
৪৩।	রসিকলাল বিশ্বাস—১০.০০ ; ৪৪। বিরসামুন্ডা ও তার সংগ্রাম	১০.০০
৪৫।	রক্তাঞ্জলি (নাটিকা)—৪.০০ ; ৪৬। পত্নীঘাতী রামের বিচার (নাটিকা)	৫.০০
৪৭।	নীল নকশা (পূর্ণাঙ্গ নাটক)—১৫.০০ ; ৪৮। বর্ণবদল (নাটিকা)	৬.০০
৪৯।	বিজয়ী আম্বেদকর (নাটিকা)—৪.০০ ; ৫০। নাটকাঞ্জলি (৪টি নাটিকা)	১৫.০০
৫১।	নিদ্রিত সমাজকে জাগাল যারা (স্কুল পাঠ্যের উপযোগী)	১২.০০

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া পাবেন ডঃ আম্বেদকরের বিভিন্ন সাইজের সাদা কালো ও রঙ্গীন ফটো, বিভিন্ন সাইজের ব্লক এবং বি. এস. পি পার্টির ব্লক।

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনার গ্রন্থসমূহ

১। বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা ডঃ আম্বেদকর — ৪০.০০
২। ডঃ বি. আর আম্বেদকরের সংক্ষিপ্ত জীবনী — ৬.০০
৩। ভারতরত্ন আম্বেদকর (স্কুলপাঠ্যের উপযোগী) — ১০.০০
৪। ব্লু-বুক (ডঃ আম্বেদকরের বাণী সংগ্রহ) — ৫.০০
৫। জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি (অনুবাদ) ১৫.০০ ; হিন্দুধর্মের প্রতীক — ৪.০০
৬। নিদ্রিত জনসমাজকে জাগাল যারা (স্কুল পাঠের উপযোগী) — ১০.০০
৭। রাণাডে, গান্ধী এবং জিন্না (অনুঃ) ৮.০০; জাতি এবং ধর্মান্তর — ২.০০
৮। অস্পৃশ্য সমাজের মুক্তি ও গান্ধিজী (অনুবাদ) — ৬.০০
৯। ভারতের জাতিসমূহ (অনুঃ) ৪.০০; অস্পৃশ্যদের প্রতি সতর্কবাণী — ২.০০
১০। ডঃ আম্বেদকরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ২.৫০; জন্ম নিয়ন্ত্রণ — ১০.০০
১১। আম্বেদকরবাদ ৪.০০ ; ১২। সমাজ সংস্কার সম্পর্কে ডঃ আম্বেদকর — ২.৫০
১৩। ব্রাহ্মণ্যবাদ ৪.০০ ১৪। মুক্তিদূত কাঁশীরাম ও তার নূতন আশা — ৫.০০
১৫। দলিতবাদ, বামসেফ ও ডি. এস. ফোর — ৩.০০
১৬। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট (পঃ বঙ্গ); (৫টি রাজ্য) ২.৫০ ; — ৫.০০
১৭। ৮ খণ্ডে আম্বেদকর রচনাবলী (অনুবাদ) ; প্রতি খণ্ড ৬০.০০ ও ৭৫.০০
১৮। রাষ্ট্র এবং সংখ্যালঘু (অনুঃ) ১০.০০; ১৯। এই দেশ, এই সমাজ — ৬.০০
২০। অভিযান (কাব্যগ্রন্থ) ১০.০০; ২১। সংরক্ষণ : অংশগ্রহণের বিষয় — ৬.০০
২২। গোমাংসপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ কেন নিরামিষভোজী হল ? (অনুবাদ) — ৫.০০
২৩। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান : পাকিস্তান এবং লোকবিনিময় (,,) — ৫.০০
২৪। আম্বেদকরের দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোকে আর্যীকরণ বনাম সংরক্ষণ — ৫.০০
২৫। শূদ্র এবং প্রতিবিপ্লব (অনুঃ) ও ২৬। বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও পতন — ৩.০০
২৭। কৃষ্ণ এবং তার গীতা (অনুঃ) ও ২৮। হিন্দুদের থেকে আরো দূরে — ৫.০০
২৯। নারী এবং প্রতিবিপ্লব ,, ৩.০০ ; ৩০। বিজয়ী আম্বেদকর (নাটক) — ৪.০০
৩১। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপাঞ্জাবের জনক ডঃ আম্বেদকর (অনুবাদ) — ৮.০০
৩২। বাংলার দলিত সাহিত্য ও তার গতিপ্রকৃতি — ২.০০
৩৩। বামফ্রন্ট সরকারের কায়েমী স্বার্থবাহী শিক্ষানীতি — ১.২৫
৩৪। বাংলাভাষায় শুভ বিবাহ-পদ্ধতি ও ৩৫। রক্তাঞ্জলি (নাটক) — ৪.০০
৩৬। বাংলাভাষায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও মরণোত্তর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পদ্ধতি — ৫.০০
৩৭। নাটকাঞ্জলি (৪টি একাঙ্ক সংকলন) ১৫.০০ ৩৮। বর্ণবদল নাটক) — ৬.০০
৩৯। একলব্যের গুরুদক্ষিণা (নাঃ) ৫.০০; ৪০। বহুজনের উৎস সন্ধানে — ১৬.০০
৪১। হিন্দুধর্মের দর্শন (অনুবাদ) ১২.০০; ৪২। ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্য — ৪.০০
৪৩। সাম্প্রদায়িক অচলাবস্থা ও তার সমাধানের পথ (অনুবাদ) — ৪.০০
৪৪। আম্বেদকর দর্শনে ধর্ম ও ৪৫। পত্নীঘাতী রামের বিচার (নাটক) — ৫.০০

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া পাবেন ডঃ আম্বেদকরের বিভিন্ন সাইজের সাদা কালো ও রঙিন ফটো, বিভিন্ন সাইজের ব্লক এবং বি. এস. পি. পার্টির ব্লক